# শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ

আশিসবরণ সামন্ত

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ কলেজ স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০৭৩

# লেখকের কথা

দীর্ঘদিনের গবেষণার ফসল 'শিক্ষা পরিদর্শন ও রূপায়ণ দর্পণ'-এর প্রারম্ভিক কথা লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমার 'স্মরণ' কবিতা দিয়ে শুরু করি। 'তাঁকে প্রণাম করি/যিনি 'অ' অক্ষরটি চিনিয়েছিলেন/তাঁকে শ্রদ্ধা করি/যিনি প্রথম 'অ' অক্ষরটি লিখিয়েছিলেন/তাঁকে স্মরণ করি/যিনি হৃদয়ভরে 'মা' বলতে শিখিয়েছিলেন/তাঁকে হৃদয়ে রাখি/যিনি আলো দেখিয়েছিলেন।'

সবের মূলে শিক্ষা। শিক্ষাই চলার পথটিকে মসৃণ করে। কর্মজীবন শুরু করেছিলাম শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। পরপর ছ'টি উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে যখন শিক্ষার জন্যে কিছু করার স্বপ্ন আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল ঠিক তখনই হঠাৎ করে 'বিদ্যালয় পরিদর্শক' পদটিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে ফেলেছি।

গ্রামের খুব সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মে দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য-কে সঙ্গী করে কেবলমাত্র নিজের উদ্যোগে বিদ্যালয় জীবন থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন পার হয়ে মাথা উঁচু করে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং এখনও সেই গতিকে সমানভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছি মাত্র।

সমাজের কথা ভেবে, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাসচেতন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে তাকিয়ে, শিক্ষার্থী থেকে বিদ্যালয় পরিদর্শক, অভিভাবক থেকে গবেষক, আরও সহজ করে বললে 'শিশু থেকে শেষ বয়সি' প্রতিটি মানুষের চাহিদার দিকে তাকিয়েই এই গ্রন্থখানি। শিক্ষা বিষয়ে কে কী ভাবছেন, কে কী চাইছেন, কী আছে কী নেই, কীভাবে বর্তমান পরিকাঠামোতেই শিক্ষাকে সহজে প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় গ্রন্থটির মাধ্যমে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালন কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিদর্শক, এমন কী গবেষক পর্যন্ত প্রত্যেকের মনের কথা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করা খুবই জরুরি ভেবে করেছি।

প্রবন্ধগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই রাজ্য পর্যায়ের পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিদ্যালয় পত্রিকাতেও ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যালয়

শিক্ষার্থীরা তাদের উপযোগী রচনাগুলি পড়ে অনেকখানি উপকৃত হয়েছে জেনে প্রেরণা পেয়েছি। শিক্ষক-অভিভাবক সমাজও রচনাগুলি পড়ে একসঙ্গে পাবার আশা প্রকাশ করেছেন। তাই, কোনো ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচনা করিনি, করেছি কেবলমাত্র সমাজ সেবার কথা ভেবে, নিজের দায়বদ্ধতার কথা উপলব্ধি করে।

পরিমার্জিত বর্তমান সংস্করণে গুরুত্ব দিয়েছি—মানবিক শিক্ষার ওপর। বিদ্যালয়স্তরে কীভাবে মূল্যবোধের শিক্ষা সহজে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার সহজতম পথের কিছু কিছু অভিমুখ চিনিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যেগুলি সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে হয়েছে।

অতীত দিনের বেশ কিছু নিবন্ধের সঙ্গে নতুন তথ্য যোগ বা কিছু বিয়োগ করতে হয়েছে। আশা করি, পাঠকসমাজ তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

যাঁদের প্রেরণা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে তাঁদের পৃথকভাবে নামোল্লেখ না করে প্রত্যেককে জানাই যথাযোগ্য সম্মান। আরামবাগ গীতিনন্দন (গভঃ রেজি ঃ নম্বর - এস ৯৪৯৪১) কর্তৃপক্ষ আমার অধিকাংশ রচনা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন। এই গ্রন্থটির বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থই তাঁদের হাতে তুলে দেবার অঙ্গীকার করছি। তাঁরা এই অর্থ শিক্ষা, সংগীতচর্চা ও গবেষণার জন্য ব্যয় করতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। এজন্য তাঁদেরও বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই। আমার সহধর্মিণী সুষমার তাগিদ আমাকে গ্রন্থরচনার কাজ তড়িৎগতিতে সমাধা করতে বাধ্য করেছে।

গ্রন্থতীর্থ-র মাননীয় সন্দীপ নায়ক মহাশয়কে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। তাঁরও প্রেরণা আমাকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে। গ্রন্থখানি আমার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রাণপ্রতিম শিক্ষার্থী বন্ধুদের, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের, সাথি বিদ্যালয় পরিদর্শকবৃন্দের এককথায় সমস্ত স্তরের উৎসাহী পাঠকবৃন্দের সামান্যতম উপকারে লাগলে জানব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। পাঠকবৃন্দের যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ আমার আগামীদিনের পাথেয় হবে।

গোবিন্দচরণ সামন্ত

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১০

আরামবাগ হুগলি

## প্রকাশকের নিবেদন

আশিসবরণ সামন্ত শুধু একজন সাহিত্যিক বা আকাশবাণীর গীতিকারই নন, দক্ষ প্রশাসক, একনিষ্ঠ বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং সর্বোপরি নিষ্ঠাবান শিক্ষা ও পরিদর্শন গবেষক। শিক্ষা ও পরিদর্শন বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন তিনি। তাঁর গবেষণামূলক রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ওই প্রবন্ধগুলি একযোগে একটি গ্রন্থে প্রকাশের প্রস্তাব দিলে তিনি নিঃশর্তে এবং নিঃস্বার্থভাবেই শিক্ষার স্বার্থে তা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন।

শিক্ষার্থী থেকে পরিদর্শক, শিক্ষক থেকে অভিভাবক, সাধারণ মানুষ থেকে গবেষক প্রত্যেকের হাতের কাছে রাখার মতো এই গ্রন্থখানি পাঠকপাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য।

পরিমার্জিত বর্তমান সংস্করণে আরও কিছু নতুন নিবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে তথ্য সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, আগ্রহী পাঠকপাঠিকাদের কাছে বর্তমান সংস্করণটিও একইভাবে সমাদৃত হবে।

প্রকাশক

# সূচিপত্র


ক. শিক্ষা ১৩-৩৮

শিশু ও তার শৈশব ১৩

শাসন, সোহাগ ও শিক্ষাক্ষেত্র ১৭

লেখাপড়ার কিছু সোপান ২০

সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা : ঠিক এই মুহূর্তে ২৪

শিক্ষকসমাজ ও আজকের শপথ ২৮

মানবিক শিক্ষা : কোথায় কখন এবং কীভাবে ২৯

শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা ৩২

জীবনশৈলী শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার প্রাসঙ্গিকতা ৩৪

খ. পরিদর্শন ৩৯-৫৬

পরিদর্শন ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা ৩৯

পরিদর্শনের আলোয় মাধ্যমিক শিক্ষা ৪১

পরিদর্শনের আলোয় প্রাথমিক শিক্ষা ৪৭

প্রাইভেট টিউশন রোধে বিদ্যালয় পরিদর্শকের ভূমিকা ৫০

পরিদর্শনের টুকিটাকি ৫৩

বিদ্যালয় শিক্ষার মানোন্নয়নে পরিদর্শকের ভূমিকা ৫৪

গ. রূপায়ণ ৫৭-১৯২

শিক্ষা : পুরোনো চিন্তা নতুন রূপে ৫৭

পরিদর্শকের দৃষ্টিতে মাধ্যমিক শিক্ষা : সমস্যা ও সমাধান সূত্র ৬০

শিক্ষকমশাইরা যখন সাহায্যকারী ৬৯

শিক্ষার্থী-জীবন ও প্রাইভেট টিউশন ৭১

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : প্রাইভেট টিউশনের প্রথম পাঠ ৭৪

শিক্ষাকে তৃতীয় শক্তি গ্রাস করে চলেছে ৭৬

প্রাইভেট টিউশন : একটি সমীক্ষা ৭৯

বিষ্ণুপুর মহকুমায় বিদ্যালয়গুচ্ছ : গঠন থেকে উত্তরণ ৮৮

আদর্শ শ্রেণি গঠন ৯৮
পরিদর্শক ও বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সভা ১০০
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর আসন বণ্টন ১০২
বিদ্যালয়ে ক্লাস মনিটর বা শ্রেণিকর্তা প্রথা প্রবর্তন ১০৬
শিক্ষার্থী ও লিখিত হোম টাস্ক ১০৮
লেখাপড়া : কিছু পরামর্শ ১১০
দৈনন্দিন জীবনে শিক্ষার্থীর সুষম সময় বণ্টন ১১২
শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা : অন্বেষণ ও বিকশিতকরণ প্রকল্প ১১৪
বিদ্যালয়ে প্রভিশন্যাল ক্লাস : একটু সদিচ্ছা ১১৭
স্কুল-পালানো শিক্ষার্থী : সমস্যা ও সমাধান সূত্র ১১৯
বিদ্যালয়ে শাশ্বত বাণীপাঠ : জীবনশৈলী শিক্ষার প্রথম ধাপ ১২১
বিদ্যালয় পত্রিকা ও রচনা নির্বাচন ১২৩
বিদ্যালয় পাঠাগার ও শিক্ষার্থী ১২৫
বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ১২৭
বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা ১২৯
পাড়ায় পাড়ায় অভিভাবক সভা ১৩৪
বিদ্যালয় কর্তৃক মাতৃসচেতনতা সভা ১৩৫
গৃহে শিক্ষার্থীর পাঠ আয়ত্তীকরণ ১৩৬
বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংবর্ধনা ১৩৭
পরীক্ষায় ভালো ফল : একটি উপায় ১৩৯
বিদ্যালয়ের উপেক্ষিত শ্রেণি পঞ্চম : প্রথা পাল্টাতে হবে ১৪১
মাধ্যমিক : শেষ মুহূর্তের পরামর্শ ১৪৩
কর্মকালান্তিক বিদায় সংবর্ধনা সভা ১৪৫
মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ কী, কেন এবং কীভাবে ১৪৭
এখনও কেন এত 'বিদ্যালয় ছুট' ১৫৪
বিদ্যালয় শিক্ষাপ্রশাসনে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ১৫৭
মাধ্যমিক শিক্ষা : আগামীদিনের প্রত্যাশা ১৬০
বিষ্ণুপুর মহকুমায় শিক্ষার সার্বিক সাফল্যে
বিদ্যালয়গুচ্ছ ও বিদ্যালয় পরিদর্শনের প্রভাব ১৭২
শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠনে আদৌ গুরুত্ব দিচ্ছে না ১৭৬
লেখাপড়া : টুকরো স্মৃতি নিটোল ছবি ১৮৩

# শিশু ও তার শৈশব

শিশুদের সামনে রেখে অনেকে অনেক কথাই বলি। উদাহরণ দিই ভবিষ্যৎ এরা। তাই, এদের গড়ে তুলতে যত্নবান হই। কিন্তু, এত সব কথার ফুলঝুরির মাঝে বিরাট একটা যে অন্তসারশূন্যতা থেকে যাচ্ছে আমরা তা খেয়াল করিনি। একটু থেমে সেটুকু খেয়াল করার মতো সময়-ই বা কই? থামলে তো পিছিয়ে যাব। না, থামার কোনো প্রশ্ন নেই। কোলে মোরগ লড়াই-এর মোরগ নিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে আলোর পরিবর্তে অন্ধকারের দিকে পা বাড়ানোর দিন। একথা কি কেউ একবারও আমরা ভেবে দেখেছি? না ভাববারও অবসর নেই।

শিশুদের বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের সরকার নির্দিষ্ট বয়স ছিল ছ'বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকে। আন্দোলনের পর আন্দোলন করে তাকে পাঁচ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এর পিছনে প্রাথমিক শিক্ষক সমাজই বেশি যুক্তি দেখিয়েছেন। কেননা, দাদা-দিদিদের সঙ্গে স্কুলের পথে পা বাড়ানো কচি কাঁচাদের যারা শিশু শ্রেণিতে আছে বলে এতদিন দেখানো হচ্ছিল তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। এর পিছনে শিশুদের শেখানো অপেক্ষা যে যুক্তিটি অন্তরালে কাজ করছিল ছাত্রসংখ্যা বেশি দেখিয়ে আরও একজন বাড়তি শিক্ষক অনুমোদন করিয়ে নিয়ে কাজের ভার লাঘব করা। তাও সার্থক হল। কিন্তু, শিশুরা কী পেল? নাথিং, কিছু না। বরং তারা ওই পাঁচ বছর পূর্ণ হলে বা তারও আগে চার বছর ন-মাস বয়সেই প্রথম শ্রেণিতে পড়তে পড়তে বাধ্য হয়ে এক বছর শৈশবের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল। যদি আমরা এই বয়সটিকেই আন্তরিকতার সঙ্গে নেব তাহলে এখনও কেন শিক্ষিত সমাজে তাদের শিশুটির বয়স সাত বছর হলে পাঁচ বছর বয়স ঘোষণা করে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি অনেকেই করতে আসছেন? যেহেতু, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় পিতামাতার ঘোষিত বয়সকে শিশুদের প্রকৃত বয়স বলে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ এখনও প্রচলিত আছে। এ ছাড়াও পিছনের দরজা দিয়ে শিশুর দ্বিতীয় বার্থ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘোষিত বয়সকে মজবুত করা হচ্ছে।

এবার বাড়িতে শিশুরা কীভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে তা একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শিশুরা ওই বয়সে ব্ল্যাঙ্ক পেপার হিসেবে স্কুলে আসবে। তাদের মনে কোথাও কোনো কালির দাগ থাকবে না। অথচ, তার অনেক আগে থেকেই তাদের মনে আঁকিবুকি কেটে তাদের মনটাকে হিজিবিজি করে তোলা হচ্ছে। আরও স্পষ্ট করে বললে সেই শিশুকে একটু পাকাপোক্ত করে স্কুলে পাঠাতে গিয়ে তাকে আমরা ইঁচড়ে পাকা করে তুলছি।

ওই চার বছর ন-মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে, বুঝিয়ে দিতে, অনেকের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে দিতে 'মোরগ লড়াই' এর মোরগ করে তুলি।

কথা ফুটলেই শিশুদের হাতে ধরিয়ে দিচ্ছি বই-খাতা-কলম। ধরিয়ে দিচ্ছি ছবি আঁকার জন্যে রং, তুলি, ক্যানভাস। হারমোনিয়ামের পর্দায় হাত কুলোয়নি। অথচ, গানের মাস্টার মশাই বা দিদিমণি নিয়োগ করে তালিম দিচ্ছি। কন্যাসন্তান হলে তো কথাই নেই, পাঠিয়ে দিচ্ছি নাচের স্কুলে। আরও? হ্যাঁ, শেখাচ্ছি আবৃত্তি। আর সবার অজান্তে শেখাচ্ছি তুমি নিজেকে ছাড়া আর কাওকে জেঁনো না। তাই নয় কি? কেননা, আজকালকার প্রায় একটু শিক্ষিত চাকরিজীবী ছোট্ট পরিবারের কর্মকর্তারা যৌথ পরিবারের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে পায়রার খোপে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে শিখেছে। তাদের ওই শিশু ছেলেমেয়েদের 'কাকা' কাকে বলে জিজ্ঞেস করলে বলে-'কাক দাকে (ডাকে) কা-কা'। এর বেশি তারা আর কী বলবে?

আমরা এক গাদা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছি আমাদের শিশুদের। তাদের শৈশব যে কী তারা জানতে পারছে না। তারা চিনছে না কাকাকাকিমা, জ্যেঠু-জেঠিমা, দাদু-ঠাকুমা-পিসিমণিদের। তারা সময় পাচ্ছে না মায়ের কাছে থাকার। তার পরিবর্তে চিনছে মাসি ( কাজের মেয়ে )-কে । কেননা, ওই মাসির কাছেই তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হচ্ছে। মা যে বাড়ির বাইরে। চাকরি করেন, বাবাও তো। তাদের তো বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্যে টাকা চাই পয়সা চাই। সবক্ষেত্রে আবার টাকা নয়। সময় কাটানো চাই। মায়েরা কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফেরার জন্য মত্ত। না-না ছেলের টানে নয়। মাসিকে সকাল করে ছেড়ে দিতে হবে। তাকে যে আংশিক সময়ের জন্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। এবার বলুনতো সেই শিশুরা যদি এখন থেকেই স্বপ্ন দেখে যে তাদের বাবা-মা ওষধি (যে গাছ একবার ফল দান করেই মারা যায়) ছাড়া আর কিছু নয় তা হলে দোষ কী?

এই শিশুরা বড়ো হয়। অনেক কিছু শিখলেও তা তারা মানসিক বয়সের সঙ্গে সমতা না রেখেই শিখে ফেলে। ফল হয় অতিরিক্ত চাপ। ব্যাহত হয় প্রকৃত শিক্ষা। ব্যাহত হয়-প্রাণ খোলা হয়ে খেলাধুলা করা, স্বাধীনভাবে শৈশব উপভোগ করা। এরা বড়ো হয়, এরা লেখাপড়া শেখে, এরা চাকরিও করে। কিন্তু, অনেকেই মানুষ হয় না। যান্ত্রিক নিয়মে থেকে যন্ত্র হয়ে ওঠে। আগেকার দিনে শৈশব উপভোগ করতে গিয়ে অনেকেই মানুষ হতে পারত। এখন ঠিক তার বিপরীত। অনেকেই অমানুষ হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মানুষ হয়। মানুষ মানেই তো আর উচ্চ-শিক্ষিত কিছু উচ্চ চাকরিজীবী নয়।

এত সব কুফল সত্ত্বেও অনেক শিক্ষিত মানুষ আলো থেকে অন্ধকারের পথে পা বাড়াচ্ছেন। ভাবছেন এইভাবেই বুঝি সমাজটাকে মানুষে মানুষে ছয়লাপ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু না। যা ভাবছেন তা এত সহজ নয়।

এই মানসিকতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে হবে। প্রকৃতির

সঙ্গে আত্মিক যোগ স্থাপনের সময় করে দিতে হবে। পরিবারের কিংবা সমাজের আর পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে একাত্মতা গড়ে তোলার সময় ও সুযোগ করে দিতে হবে।

বর্তমানে এই মানব-যান্ত্রিক যুগে মা-বাবা হয়তো বা শিশুদের বেশি সময় দিতে পারেন না। তাই যারা ঠকে শিখে বুঝতে শিখেছেন বা উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারা শিশুর শৈশবটা কাটানোর ভার কিছু কিছু শিশু সংগঠনের হাতে তুলে দিতে চান। যৌথভাবে আঁতুড় পুকুরে মাছের চারাপোনা বড়ো করার মতো বড়ো করতে থাকেন। তারা বয়সের সঙ্গে সমতা রেখে শিশুদের শৈশব ফিরিয়ে দিতে চান। এইখানেই শেষ নয়। শিশুদের মা-বাবার সান্নিধ্য এবং সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য পাঁচজনের সান্নিধ্যও বড়ো সান্নিধ্য। এই ভাড়াটে পরিবেশে শিশুরা সেই অভাবটার আংশিক পুষিয়ে নিতে পারছে এইটাই এখন একমাত্র সান্ত্বনা।

আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নিজে কী করছি তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। মন মুখ এক করা প্রয়োজন। মন মুখ এক করার কথা তো বহু আগেই ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলে গেছেন। মুখে বলছি এক, বাস্তবে করছি অন্য। এটা কিন্তু কাম্য নয়। ওই রকম বলারও কোনো অর্থ থাকে না। এই প্রসঙ্গে নিজের একটা কথা বলার সুযোগ বা অধিকার এসে গেল। বলার মতো অধিকার আছে মনে করেই বলছি। আমি নিজে এখনও যৌথ পরিবারের সদস্য। আমি নিজে একজন চাকরিজীবী মহিলার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারতাম, কিন্তু হইনি। ঘৃণা করেও নয়, আবার টাকাপয়সা চাই না বলেও নয়। আমার স্ত্রী যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিতা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেবলমাত্র একজন রুজি-রোজগার করুক—এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে শিশুর সঙ্গে তার মা-বাবার সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করার তাগিদে। শুধু তা-ই নয়, যে দেশে প্রায় প্রতিটি পরিবার বেকার সমস্যায় জর্জরিত, অধিকাংশ পরিবারে কোনো চাকরিজীবী নেই সেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই চাকরি বড়ো বেমানান মনে হয়েছে আমার কাছে। যে কোনো একজন সমাজসেবামূলক কাজে ব্রতী থাকলেই তো হল। আবার, আমার ছেলেমেয়েদের শৈশব অতিবাহিত হয়েছে যৌথ পরিবারে। ভাবতে পারেন আমার বাবা এবং দুই কাকা যাঁদের বয়স ৭৫-৮৫ এর মধ্যে তাঁরা এখনও যৌথ পরিবারে বাস করেন। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা, নাতি-নাতনিরা এখনও একই হাঁড়িতে রান্না করা ভাত খায় অর্থাৎ নির্ভেজাল যৌথ পরিবারের সদস্য। পারিবারিক দায়বদ্ধতার কথা আমরা কোনো ভাই বোনই ভুলিনি। এই পরিবারের সদস্যরা যথেষ্টই সমাজ-সচেতন, যথেষ্টই পারিবারিক। পরবর্তী জীবনে পড়াশোনাতে এবং কর্মজীবনে কেউই পিছিয়ে নেই।

সামাজিক পরিবেশ, পারিবারিক পরিবেশ এখন আর অনেক ক্ষেত্রেই অক্ষত নেই। নানান কারণ অবশ্যই আছে। তার মধ্যে প্রথম নম্বরে পড়ে রাজনীতি। দ্বিতীয় নম্বরে পড়ে একলাফে অত্যাধুনিক হয়ে ওঠার জন্যে প্রতিযোগিতা এবং অনুকরণপ্রিয়তা। সমানে এই অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা দূরদর্শনের পর্দার মাধ্যমে গাঁয়ে-গঞ্জে খুব সামান্য খরচেই

পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। যাতে পশ্চিমী দুনিয়ার সভ্যতা যা সেই মাটির উপযোগী তাকে বলপ্রয়োগে ভারতবর্ষের মাটিতে এনে পুঁতে দিয়ে গাছ বাঁচানোর চেষ্টা হচ্ছে। আমরা তো অন্ধভাবে অনুকরণ করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছি। ভারতবর্ষের সুস্থ সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করছি। এর রূপকার কিন্তু তরুণ সমাজ। আমরা তরুণ সমাজের মনকে ওইদিকে ভিড়িয়ে দিয়ে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে চাইছি। কেননা, ওরা ভোটার, আমাদের মধ্যে অনেকেই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপাত্র। তাই, ওদের বাধা দিলেই তো ওরা পথে বসাবে।

সবসময় আমাদের চারদিকে সমস্যা ছড়িয়ে আছে। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ যেমন বাতাসের সমুদ্রে বাস করে ঠিক তেমনি, বর্তমান যুগের মানুষ সমস্যার সমুদ্রে বাস করছে। এই হাজারো সমস্যার যুগে প্রকৃতই কিছু করা যায় কী না সে বিষয়ে আসুন, একটু ভেবে নিই।

জুন ১৯৮৬

# শাসন, সোহাগ ও শিক্ষাক্ষেত্র

সোহাগ এবং শাসন এই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি শব্দ পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনে হয় যেন একটিকে বাদ দিলে অপরটির অস্তিত্ব থাকে না। অথচ, এই দুটি শব্দের অস্তিত্বই আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাবিয়ে তুলেছে। ঝড় তুলেছে শিক্ষিত সমাজে। শিক্ষার গতি নিয়ন্ত্রণে এই শব্দদুটির প্রভাব বিস্তার লক্ষণীয়।

সমাজে বিভিন্নক্ষেত্রে এই শব্দদুটির ব্যাপক প্রয়োগ এবং সার্থকতা আছে। সেই সব ক্ষেত্রে ওই শব্দদুটি নিজ নিজ জগতে যথার্থই সার্থক। কিন্তু, প্রশ্ন হল শিক্ষাক্ষেত্রে ? এইখানেই যত আলোচনা, ঝড়, বাধা-বিপত্তি। স্বাভাবিকভাবে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্যের পিছনে তাঁরা নানান যুক্তি দেখিয়ে আসছেন। কোনো যুক্তিই উপেক্ষনীয় নয়। তবুও তো আমাদের একটি লক্ষ্যে একটি স্থির বিন্দুতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই হবে।

প্রাচীনকালে আশ্রমিক পরিকাঠামোয় গুরুগৃহে গুরুর ইচ্ছায়; শিক্ষার পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হত। তখন শিক্ষার্থীরা ছিলেন সেই গুরুর আপনজন। তাঁরা ক্রমে ক্রমে গুরুর নিজ পরিবারভুক্ত সদস্যরূপে পরিগণিত হতেন। তাতে ছিল গুরু-শিষ্যর আত্মিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে শিষ্যরা গুরুআজ্ঞা পালন করতে গিয়ে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করতেও বদ্ধপরিকর ছিলেন। কোনো প্রতিবাদ-এর কথা চিন্তাই করা যেত না বা গুরুবাক্য লঙ্ঘন করার কথা কখনোই কল্পনা করতে পারতেন না তাঁরা। তাই, 'শাসন'-এর এত আধুনিক এবং আক্ষরিক প্রয়োগও প্রয়োজন ছিল না। সবটাই যে সোহাগে হত তা'ও নয়, হত ভক্তিতে, হত শ্রদ্ধায় এবং আজ্ঞা পালন করার ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে। এর সৃষ্টি কিন্তু, শিক্ষক তথা শিক্ষাগুরুর আপন ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মাধ্যমে। এককথায় গুরু বা শিক্ষকের উদাহরণযোগ্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই ছিল শিক্ষার্থী তথা শিষ্যের কাছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ। পরে পরে সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ যতই এগিয়ে যেতে শুরু করল, যতই শিক্ষার পরিবেশের-পরিকাঠামোর পরিবর্তন হতে লাগল ততই দেখা দিল যান্ত্রিকতা। সেই যান্ত্রিকতা বাসা বাঁধল শিক্ষার্থীর মনে। শিক্ষার গতিপ্রকৃতির পরিবর্তন হল। শিক্ষার্থী হারাতে শুরু করল বিশ্বাস ও ভক্তি। গুরু তথা শিক্ষকেরাও পারলেন না শিক্ষার্থীদের সেই আনুগত্য ধরে রাখতে। কেননা, জীবনযাপনের প্রয়োজনে এবং চাহিদা মেটাতে তাঁরা যতই যান্ত্রিক হতে শুরু করলেন, আদর্শ হতে বিচ্যুত হলেন ততই শিক্ষার্থী শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে শুরু করল। এল অনিয়ম, এল উচ্ছৃঙ্খলতা। চারদিকেই